



নারী কর্মক্ষেত্রে: তাঁরা কিস্তি হারে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি?

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 12:28 PM | বিভাগ: এইচআরএম



স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ্য নারীর অদখো বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নতৃত্বের অপ্ৰকাশিত গল্প

“মানুষ কী ভাববে?” অদৃশ্য সামাজিক নজরদারি

বাংলাদেশে করপোরেটে বাস্তবতায় অনেকে নারী প্রতিদিন এক ধরনের অদৃশ্য সামাজিক নজরদারি মধ্যে কাজ করেন। তাঁদের কর্মজীবনে অনেকে সদিধান্ত শুধু পশোগত বাস্তবতা দিয়ে নির্ধারণিত হয় না; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অন্যদের দৃষ্টিভিঙ্গি, সামাজিক প্রত্যাশা এবং সম্ভাব্য বচিার। ফলে একজন নারী অনেকে সময় শুধু কাজ নিয়ে ভাবনে না। তিনি ভাবনে কীভাবে কথা বলবে? কতটা দৃঢ় হবে? কতটা দৃশ্যমান হবে? বেশি দৃঢ় (অ্যাসারটিভ) দেখালে কী হবে? বেশি ফ্রেন্ডলি দেখালে কী হবে? বেশি উচ্চাকাঙ্খী দেখালে মানুষ কী ভাববে? অনেকে সময় তিনি নিজের সদিধান্তের সম্ভাব্য ফলাফলের চয়ে সেই সদিধান্ত সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বেশি ভাবতে বাধ্য হন। একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যে আচরণকে নতৃত্বের গুণ হিসেবে দেখা হয়, একজন নারীর ক্ষেত্রে একই আচরণ কখনো কখনো ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে অনেকে

নারী ধীরে ধীরে নিজদের প্রকাশ সীমিত করতে শুরু করেন। নিজদের প্রকৃত ব্যক্তিত্বকে কিছু অংশ আড়াল করেন। কিছু মতামত নিজের মধ্যস্থে রাখেন। কিছু ঝুঁকি নিওয়া থেকে বরিত থাকেন। কিছু সুযোগের জন্য নিজেকে সামনে আনেন না। সবকিছু মিলিয়ে এটি এমন এক বাস্তবতা তৈরি করে, যেখানে একজন মানুষ তাঁর সম্পূর্ণ সক্ষমতা নিয়ে উপস্থিতি হতে পারেন না। এটি শুধুমাত্র একটি সামাজিক সমস্যা নয়। এটি একটি সাংগঠনিক সমস্যা। এটি একটি নিত্যত্বগত সমস্যা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি প্রতিভা দমন (ট্যালেন্ট সাপ্রেশন)-এর একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু শক্তিশালী রূপ। কারণ যখন একজন মানুষ নিজের সামর্থ্যের চেয়ে ছোট হয়ে কাজ করতে বাধ্য হন, তখন কষ্টটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়; কষ্টগিরিস্ত হয় প্রতিষ্ঠান, নিত্যত্বের পাইপলাইন এবং শেষ পর্যন্ত পুরো কর্মক্ষেত্রে।

“গুড গার্ল সিনিড্রম” যে বিষয়ে আমরা খুব কম কথা বলি

বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কৃতি ময়েদের অনেকে ইতিবাচক মূল্যবোধ শেখায়। সম্মান করতে শেখায়। দায়িত্ব নতি শেখায়। সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে শেখায়। অন্যের প্রতি সংবেদনশীল হতে শেখায়। কিন্তু একই সঙ্গে অনেকে সময় এমন কিছু মানসিক কাঠামোও তৈরি করে, যা কর্মজীবনে

প্রতিযোগিতামূলক বাস্তবতায় অদৃশ্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনেকে পরিবারেই ময়েকে ছোটবলো থেকে শেখানো হয় ভদ্র হও। বেশি তরুণ করো না। সবাইকে খুশি রাখো। না বলতে নেই। অন্যের জন্য আগে ভাবো। এসব শিক্ষা অবশ্যই জীবনে অনেকে ক্ষেত্রে মূল্যবান। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কখনো কখনো এগুলো ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। কারণ অনেকে ক্ষেত্রে ময়েরো ছোটবলো থেকেই সম্পর্ক রক্ষা, সমন্বয় করা এবং অন্যের চাহিদাকে

অগ্রাধিকার দেওয়ার শিক্ষা বেশি পায়। অন্যদিকে ছেলেদের তুলনামূলকভাবে নিজের মত প্রকাশ, ঝুঁকি নিওয়া এবং ব্যক্তিগত অর্জনের দিকে বেশি উৎসাহিত করা হয়। ফলে কর্মজীবনে এসে অনেকে নারী দক্ষতা বা যোগ্যতার অভাবে নয়, বরং নিজের প্রাপ্য দাবি করা, দৃশ্যমান হওয়া কিংবা নিজের পক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে পছিয়ে পড়েন। এর ফলস্বরূপ অনেকে নারীকর্মী পদোন্নতির জন্য নিজেকে সামনে আনেন না। সলোৱী নগেসায়িশন করতে অস্বস্তি বোধ করেন। লডারশপি রোল-এর জন্য আবদন করতে দ্বিধা করেন। নিজের অর্জন ও অবদান তুলে ধরতে সংকোচ বোধ করেন। কারণ তাঁদের ভেতরে একটি অদৃশ্য প্রশ্ন কাজ করে-

“মানুষ কী ভাববে?”

আমি কর্মজীবনে এমন অনেকে নারীকে দেখেছি, যাঁরা কাজের যোগ্যতায় নয়, বরং নিজের প্রাপ্য দাবি করার ক্ষেত্রে পছিয়ে ছিলেন। তাঁরা কাজ করছেন। ফলাফল দিয়েছেন। দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু নিজদের অর্জনের গল্পটি নিজেরাই বলেননি অথচ করপোরেটে জগৎ সবসময় শুধু আপনার কাজ দেখে

না। অনেকে সময় আপনার দৃশ্যমানতাও দেখে। আপনার উপস্থিতিও দেখে। আপনি নিজের সম্ভাবনার পক্ষে কতটা কথা বলতে পারেন, সটেও দেখে। কারণ আপনি যদি নিজের অর্জনের গল্পটিনা বলেন, অনেকে সময় অন্য কটে সটে বিলবে না। আর বললেও হয়তো সটে আপনার প্রকৃত অবদানকে পুরোপুরি তুলে ধরবে না। আর ঠিকি সখোনই অনেকে মধোবী নারী অজান্তেই প্রত্যাগতিয় পছিয়ে পড়েন। যোগ্যতার অভাবে নয়। নজিদে সোমনে নয়ি আসতে না পারার কারণে। কখনো কখনো সমস্যাটি সিক্ষমতার নয়। সমস্যাটি হিলো সিক্ষমতাকে দৃশ্যমান করে তোলার।

অফসি কাজ, ঘরে দ্বিতীয় শফিট

কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান নয়ি আমরা প্রায়ই আলোচনা করি। কিন্তু অনেকে সময় ভুলে যাই যে অফসি কাজই তাঁদের দিনের শেষে কাজ নয়। একজন পুরুষ অফসি থেকে ফরিলনে। একজন নারীও ফরিলনে। দুজনই দিন ছিল দীর্ঘ। দুজনই ক্লান্ত। কিন্তু অফসিরে দরজা পরেয়ি তাঁদের দিনের গল্প আর এক থাকে না। অনেকে ক্ষেত্রেই দিনের বাকি অংশ এক রকম হয় না। অনেকে নারীর জন্য অফসি শেষে শুরু হয় আরকেটি কর্মদবিস। আরকেটি দায়িত্বেরে তালকি। আরকেটি শফিট। সন্তানরে যত্ন। পরিবারেরে প্রয়োজন। গৃহস্থালির সমন্বয়। বয়স্ক সদস্যদেরে দেখাশোনা। সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব। এসব কাজেরে অনেকেগুলোর কোনো চাকরি বর্ণনা নই। কোনো বলেন নই। কোনো পারফরমেন্স রটেই নই। কিন্তু দায়িত্ব আছে। প্রত্যাশা আছে। আর প্রায়শই সেই প্রত্যাশাগুলো নীরব। ফলে অনেকে নারীর কর্মদবিস অফসি ছাড়ার সঙ্গে শেষে হয় না। বরং নতুন রূপে আবার শুরু হয়। আমরা ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নয়ি কথা বলি কিন্তু বহু নারীর বাস্তবতা হলো-

ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স নয়। ওয়ার্ক-লাইফ সারভাইবল

আর বছরের পর বছর এই ভারসাম্যহীন চাপ বহন করতে করতে অনেকেই ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যোগ্যতার অভাবে নয়। প্রচেষ্টার অভাবে নয়। বরং একই সময়ে একাধিক পূর্ণকালীন দায়িত্ব বহন করার কারণে। আর সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো, এই অতিরিক্ত চাপেরে স্বীকৃতি অনেকে সময় মলে না। এমনকি ক্লান্তির কথা বললেও কখনো কখনো শুনতে হয় "তোমাকে তো কটে কাজ করতে বাধ্য করেনি।" "এত কষ্ট হলে চাকরি ছেড়ে দাও।" "এটা তো তোমার নিজেরে সিদ্ধান্ত।" বাক্যগুলো শুনতে হয়তো সাধারণ মনে হয়। কিন্তু এর ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা লুকিয়ে থাকে যনে একজন নারীর পশোগত স্বপ্ন, ক্যারিয়ার কিংবা আত্মপরিচয় কোনো প্রয়োজন নয়; বরং একটি ঐচ্ছিক বিষয়, যা প্রয়োজনে ত্যাগ করা যতে পারে। আর ঠিকি সখোনই সমস্যাটি আরও গভীর হয়ে ওঠে। কারণ একজন পুরুষেরে ক্যারিয়ারকে আমরা সাধারণত দীর্ঘময়াদি বিনিয়োগ হিসেবে দেখি। কিন্তু অনেকে ক্ষেত্রেই একজন নারীর ক্যারিয়ারকে এখনও এমন কিছু হিসেবে দেখা হয়, যা পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেলে সবার আগে ছেড়ে দেওয়া যতে পারে। আর সেই ক্লান্তির প্রভাব সবসময় দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু তা প্রভাব ফলে আত্মবিশ্বাসে। উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। নতুন সুযোগ গ্রহণেরে আগ্রহে। এবং অনেকে সময় নেতৃত্বেরে পথে এগিয়ে যাওয়ার

সাহসেও। কারণ মানুষ সাধারণত একদিনে হাল ছেড়ে দেয় না। সে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়। আর সেই ক্লান্তি অনেকে সময় একজন মানুষের স্বপ্নকেও ছোট করে দেয়।

মাতৃত্বের পরে অদৃশ্য জরমিনা

মাতৃত্ব একজন নারীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ, স্বাভাবিক এবং উদযাপনযোগ্য অধ্যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বাস্তবতায় অনেকে সময় এটি এমনভাবে বিবেচনা করে, যেন একজন দক্ষ পেশাজীবীর সক্ষমতা, প্রতিশ্রুতি বা দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা হঠাৎ করেই প্রশ্নের মুখে পড়ছে। অবশ্যই সব প্রতিষ্ঠান বা সব ব্যবস্থাপক এমনটাই করেন না। তবে কর্মজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি এমন কিছু উদাহরণ দেখেছি, যখন মাতৃত্বের পরে একজন নারীর প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি এবং আচরণ সূক্ষ্মভাবে বদলে গেছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে ফিরে আসার পর বড় প্রকল্প আর তাঁর হাতে দেওয়া হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ নতুন সুযোগ কম হয়েছে। ভ্রমণভিত্তিক বা দৃশ্যমান দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতির আলোচনায় তাঁর নাম আগের মতো আর সামনে আসেনি। কয়েক সারসরি বলেনি, “তিনি পারবেন না, কয়েক বলেনি, তিনি আর নতুন জন্মের জন্য প্রস্তুত নন।”

কিন্তু অনেকে সময় সিদ্ধান্তগুলোই সেই বার্তা বহন করেছে। আর সমস্যাটি স্থানীয়। কারণ এই পরিবর্তনগুলো সাধারণত প্রকাশ্য বিষয় হিসেবে দেখা যায় না। এগুলো আসে অনুমান থেকে। ধারণা থেকে। কখনো কখনো অতিরিক্ত সহানুভূতি থেকেও। ধরে নেওয়া হয় তিনি হয়তো এখন বেশি দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। ভ্রমণ করতে পারবেন না। নতুন চ্যালেঞ্জে আগ্রহী হবেন না। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসে না করেই তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গবেষণায় এই প্রবণতাকে প্রায়ই “মাদারহুড পেনাল্টি” বলা হয়। অর্থাৎ মাতৃত্বের পরে একজন নারীর ক্যারিয়ারের গতি, সুযোগ কিংবা মূল্যায়ন এমনভাবে প্রভাবিত হয়, যা একই পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ কর্মীর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। এবং সত্য হলো বাংলাদেশের কর্পোরেট বাস্তবতায়ও এই অদৃশ্য জরমিনা এখনও পুরোপুরি দূর হয় যায়নি। কয়েক হয়তো চাকরি হারান না। কিন্তু অনেকে সময় হারিয়ে যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। একটি পদোন্নতি একটি নতুন জন্মের ভূমিকা। অথবা ভবিষ্যতের একজন সম্ভাবনাময় নতুন।

(চলবে)